INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তায় বাস্তবজগৎ ও আধ্যাত্মিকতা

* ড. শর্মিষ্ঠা ঘোষ

https://doi.org/10.5281/zenodo.18139553

সারসংক্ষেপ :

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আমার তো মনে হয় আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা"[১]। সীমা হচ্ছে প্রকৃতি ও মানুষ, যা বাস্তবজগৎকে ব্যক্ত করে এবং অসীম হচ্ছে ব্রহ্ম, যা আধ্যাত্মবাদী চিন্তাকে ব্যক্ত করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, চিন্তা ও চেতনার এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উপনিষদের বাণী 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' তিনি অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন, "এই যে প্রকাশমান জগৎ এ আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপ ধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ"[২]। অর্থাৎ সীমা ঐ অসীমের প্রকাশ, সীমার মাঝে অসীমের এই প্রকাশেই আনন্দ। তাই তিনি বলেছেন –

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী"। (চিত্রা)

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল জীবন বিশাল ও বৈচিত্র্যময়। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, উপন্যাসিক, চিত্রকর, দার্শনিক ও প্রকৃতি-পরিবেশপ্রেমী। তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে চারপাশের পরিবেশ তথা প্রকৃতি। বাল্যকাল থেকে এই প্রকৃতির সঙ্গে কবির নিবিড় যোগ। প্রকৃতি পরিবেশ ছিল তাঁর চিন্তায়, চেতনায়, অনুভবে। তবে প্রকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে। চল্লিশের পূর্বে প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রীতিপূর্ণ। এরপর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের সময় থেকে আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশ, এক পরিণত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই সময় অদ্বৈতচিন্তা বা ঐক্যবোধ দ্বারা প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে এক করে উপলব্ধি করেন। তবে এখানে শেষ নয়; তৃতীয় পর্যায়ে আধ্যাত্মিক অদ্বয় চিন্তাকে চিন্তনের কেন্দ্রে রেখে বাস্তব জগতে সীমার মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্ম করেন। এইভাবেই সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষের হাজারো বন্ধনের মাঝে এই ভাবেই তিনি মুক্তির আস্বাদ লাভের কথা বলেছিলেন।

'আধ্যাত্মিক' শব্দটির অর্থ আত্মসম্বন্ধীয় বিষয়। যা পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও মন দ্বারা প্রাপ্ত নয়। যেমন, ধর্ম, মুক্তি, ব্রহ্ম প্রমুখ বিষয়ক চিন্তা। 'বাস্তব জগৎ' বলতে পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত জগৎকে বোঝানো হয়। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও বাস্তবজগৎ মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে যে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল - তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

মুলশব্দ : পরিবেশচিন্তা, মুক্তি, বিশ্বরূপ, বন্ধন, আনন্দ

* *SACT, Dept. of Philosophy, Fakir Chand College*

ভূমিকা :

আজকের প্রকৃতি পরিবেশ বিপন্ন বহুমাত্রিক দূষণ সংকটে। উন্নয়ন হওয়া উচিৎ, উন্নয়ন সকলের কাম্য তবে তার জন্য প্রকৃতি পরিবেশের সুষমা, সাম্য ও সুস্থিতিকে নষ্ট হওয়া কাম্য নয়। আজ মানুষ উন্নয়নের আকাঙ্খায় গাছের ছায়া, ময়ূরের নাচন, কোকিলের ডাক, প্রশান্তিময় সকাল, বিকালের সোনারোদ ইত্যাদি হারিয়ে ফেলতে চলেছে। যন্ত্রময় জগতে উন্নতি শিখরে উঠতে, ছুটছে সকলে যন্ত্রের পিছনে এবং পরিবেশকে নিজ প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে উদ্ধত হয়েছে। তাই আজ উষ্ণায়ন, মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রমুখ সমস্যা উদ্বেগ সৃষ্ট করছে। বর্তমান প্রকৃতির পরিবেশের এই অবস্থার কারন হিসেবে অনেকেই পাশ্চাত্যের পরিবেশের প্রতি কর্তৃত্বের ধারণাকে দায়ী করে থেকেন[i]। হিব্রু এবং খ্রীস্টানরা প্রচার করেছিল প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রভুত্ব, আধিপত্য করবার কথা। এঁদের মতে ঈশ্বর প্রকৃতির থেকে আলাদা। তিনি বাস করেন স্বর্গে। ঈশ্বরই প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাই তার উপরে প্রভুত্বও করেন। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতি থেকে আলাদা ভাবে। সুতরাং মানুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর আলাদা আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান। বাইবেলে বলা হয়েছে – "For all things in heaven and on earth were created in him – all things, whether visible or invisible, whether thrones or dominions, whether principalities or powers all things were created through him and for him".৩ পুরানো ও নতুন বাইবেলে মানুষের স্থান নির্ধারিত হয়েছে 'ঈশ্বরের প্রতিকৃতি' হিসাবে। প্রকৃতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে মানুষকে। পরিবেশ বিপর্যয়ের এটি হল প্রত্যাদেশীয় ধর্মের একটি পর্যায়। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা অনুযায়ী নৈতিকতার উদ্ভব মানুষকে কেন্দ্র করেই, একমাত্র মানুষই স্বতঃমূল্যের অধিকার। তারা মনুষ্যেতর প্রকৃতির কেবল পরতঃমূল্য স্বীকার করে। এরূপ প্রকৃতির কোন নৈতিক মর্যাদা আছে বলে তারা মনে করেন না। সেইজন্য তারা প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্যকেও অস্বীকার করে। বর্তমানে শিল্পায়ন, যন্ত্রনির্ভর, সহজ ও আয়েশী জীবনের দিকে অতিমাত্রায় ঝোঁকের রেশ ধরে প্রকৃতিকে বিষিয়ে তুলেছে মানুষ। তাই প্রকৃতিও মানুষের প্রতি ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থাই মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হতে বাধ্য করেছে। তাই বিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য, শ্রদ্ধা প্রভৃতি নৈতিক মনোভাবের প্রেক্ষিতে দর্শনের একটি শাখা হিসেবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম[ii]। আমেরিকার পরিবেশবিদ George Sessions ১৯৮৫ সালে তাঁর "Deep Ecology : Living as if Nature Mattered" গ্রন্থে বলেন, "All organisms and entities in the ecosphere, as parts of the interrelated whole, are equal in

intrinsic worth".৪ আর্নে নেস (Arne Naess) এবং জর্জ সেসন্‌স (George Sessions) গভীর বস্তুবাদের মধ্যে দিয়ে সকল বস্তু যে স্বতঃমূল্যবান তা উল্লেখ করেন। উদ্ভিত, প্রাণি, সমগ্র জগৎকূলের স্বার্থরক্ষায় মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্বের পশ্চাতে যে নীতিবোধ ক্রিয়া করে তা হল – সকল বস্তুই স্বতঃমূল্যবান এবং পবিত্র। তাই বিংশ শতাব্দীর পরিবেশবাদী দার্শনিকগণ উপলব্ধি করেন জগতের যেকোন বস্তুর সুরক্ষা হল নীতিবান ব্যক্তির কর্তব্য ও দায়িত্ব।

১৯৭২ সালে বিজ্ঞানী জেমস্ লাভলক গাইয়া তত্ত্ব (Gaia Theory) উপস্থাপন করেন, যা ১৯৭৪ সালে অণুজীববিজ্ঞানী মারগুলিস সমর্থন করেন। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, পৃথিবীর সকল জৈব ও আশেপাশের সকল অজৈব পরিবেশ একত্রিত হয়ে একটি একক স্বনিয়ন্ত্রিত জটিল প্রণালী গঠন করে জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে। এককথায় পৃথিবী নিজেই একটি জীবন্ত সত্তা। অর্থাৎ সবই এক বিশ্বপ্রাণের অংশ।

পাশ্চাত্যের পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু সভ্যতার উষালগ্ন থেকে ভারতীয় মনীষীগণ প্রকৃতির অকৃপণ দানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব নিয়ে তার নিকট কৃতজ্ঞ থেকেছেন এবং প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদানের স্বতঃমূল্য স্বীকার করেছেন। প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদান – ইট, কাঠ, পাথর, জল, বায়ু, নদী, পাহাড়, উদ্ভিত, কীটপতঙ্গ, পশুপাখী ইত্যাদি সকলেরই নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার এবং নিজেদেরকে বিকশিত করার সমান অধিকার আছে। অর্থাৎ বহু হাজার বছর পূর্বে ভারতীয় ধর্মতত্ত্বে পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিষয়গুলিকে দেখতে পাওয়া যায়।যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদের "বসুধৈব কুটুম্বকম" এই ধারণার মধ্যে দিয়ে পরিবেশ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ককে খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'বসুধা' অর্থ হল পৃথিবী আর 'কুটুম্বকম' হল পরিবার বা আত্মীয়। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পৃথিবী হল একটা পরিবারের মতো। মানুষ ও প্রকৃতির সকলেই একই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত, সকলের মধ্যেই রয়েছে আত্মীয়তা। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'সর্বভূতে আত্মদর্শন' অর্থাৎ তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত - এই ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে দিয়েও জীব ও জগৎ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত তা বোঝানো হয়েছে। এই সকল ধারণার দ্বারা সিক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশভাবনা। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ একজন কবি। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য কোনোদিনই একেবারে কাঁটাছাটা একটি অনড় সিদ্ধান্ত নয়, সত্য কোনোদিনই তাঁর কাছে 'মতবাদে'র কঠোর রূপ ধারণ করেনি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুভূতির জগতের ও চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এক সমগ্ররূপ পাওয়া যায়।

পরিবর্তন তো প্রকৃতির নিয়ম, তবে এই পরিবর্তন খন্ড দৃষ্টিতে; অখন্ড দৃষ্টিতে সমগ্ররূপটি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য, দর্শনের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিচিন্তাকে এক অখন্ড দৃষ্টিতে, তার সমগ্র রূপটিকে বুঝতে হবে। তবেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পরিবেশ চিন্তার যথার্থ রূপ পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের মূল বিষয় বিশ্বচেতনা; এই বিশ্বচেতনার মূল প্রকৃতি, মানুষ ও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম[iii]কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শৈশব থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর কখনও বিচ্ছেদ ঘটেনি[iv]। তবে প্রকৃতিকে সঙ্গে সম্পর্কের, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে কবির এক প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক চিন্তা গভীরতর হওয়াতে 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' এই চিন্তা তাঁর মধ্যে দৃঢ়তর হয়। এক, অদ্বয়, একক যিনি বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর, শক্তি ও শান্তিরূপে বিরাজ করে। অর্থাৎ বিশ্বের সকল কিছু ঐ এক রূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে তখন সম্পর্কে ঐক্যের।

মানব জীবনের লক্ষ্য মুক্তি লাভ বা আনন্দ লাভ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন এই মুক্তি লাভ সম্ভব সীমার মাঝে, প্রকৃতি, মানুষের মাঝে, এই বাস্তব জগতের মাঝে। আর এই জগৎ আনন্দময় ব্রহ্মের প্রকাশ। সীমার মাঝেই এই প্রকাশকে উপলব্ধির মধ্যেই পাওয়া যায় মুক্তির আস্বাদ। সাধারণ জীবন থেকে মুক্তি, শৈশব থেকে বার্ধক্য, আধ্যাত্মিক থেকে কর্মময় বাস্তবজগৎ এই যে উত্তরণ; এই উত্তরণে প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের সহচরী, সঙ্গী। 'রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তায় বাস্তবজগৎ ও আধ্যাত্মিকতা' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তনের এই ক্রমবিকাশে জায়গাটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তায় প্রথমপর্ব (১৮৬১ থেকে ১৯০০) :

১৮৬১ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। এখানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠা। ১৯৭৭-৭৮ সালে তাঁর সাহিত্য জগতে প্রবেশ। "রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তায় বাস্তবজগৎ ও আধ্যাত্মিকতা" প্রবন্ধের প্রথম পর্বটির দুটি স্তর পাওয়া যায়। এক, শৈশব থেকে ১৮৮৯, এই সময়কালের বেশির ভাগ তিনি কলকাতা ঠাকুর বাড়ি কাটিয়েছেন। ১৮৯০ সাল থেকে এক পরিবর্তন আসে, এই সময় তিনি জমিদারী কাজ দেখাশোনা করতে শিলাইদহে পদ্মার বোটে প্রায় ১০বছর সময় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। প্রকৃতি পরিবেশই মানুষের চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটায়। তাই কোথায় সে বসবাস করছে তার উপরে নির্ভর করে তাঁর চিন্তা-ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো আবেগপ্রবণ কবির ক্ষেত্রে তা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

শৈশব থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জীবনের শুরু প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের মাধ্যমে। যদিও প্রথমদিকে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

না[v]। দূর থেকে প্রকৃতিকে দেখেই তিনি প্রকৃতির প্রতি প্রগাঢ়রূপে আকর্ষিত হয়েছিলেন; যা ক্রমশ নিবিড় থেকে নিবিড়তম হয়েছিল। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, “বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ ছিল, এমনকি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া আসা করতে পারতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার জানলার নানা ফাঁক ফোকড় দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইতো”[৫]।

পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রার সময় প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। এই সময়ের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় ‘জীবন স্মৃতি’তে। “সমস্তদিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না – পাছে কিছু একটা এড়াইয়া যায়, এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে, পথের কোনো বাঁকে, পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময় মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া, শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুলকুল করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন”।[৬]

তাঁর কাব্যগ্রন্থ সন্ধ্যা সংগীতের বিচ্ছেদ, প্রভাত সংগীতের মিলন সমস্তেরই মূলীভূত কারণ এই বিশ্বপ্রকৃতি। “প্রভাত সংগীত”(১৮৮৩) এর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য স্রোতের প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। আর যাত্রাপথের সহচর হল প্রকৃতি-পরিবেশ।

“আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ”! (প্রভাত সঙ্গীত, নির্ঝরের স্বপ্ন)

১৯৯০ সাল জমিদারী কাজ দেখাশুনা করতে কবি পৌঁছালো শিলাইদহে। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী মহাশয় বলেছেন, “মনে মনে কবি ইহাকে হয়তো নির্বাসন ভাবিয়াছিলেন কিন্তু দেখা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার স্বস্থানে আগমন। কবির অজানিতে অদৃষ্ট আর এক নূতন লীলার আসন পত্তন করিল। এটি যে কত বড় আর অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্য সেই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এখানকার পদ্মা নদী কবির প্রধান মানসিক আশ্রয় ও অবলম্বন হইয়া উঠিল”।[৭] লীলাময়ী পদ্মা কবির নৌকাকে যে কূলে নিয়ে গেল তা যেন প্রকৃতির কোলে মানুষের সংসারের কূল। সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালি কাব্যগ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। “আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি

– বৈশাখের খররৌদ্র তাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াবন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পান্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি – সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা"।[৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে এই সময়কার চিত্রটি পরিষ্কার ব্যক্ত করেছেন। জোড়াসাঁকোতে প্রকৃতিকে দূর থেকে দেখেছেন, মস্ত পরিবারের বহু মানুষের মধ্যে বড় হয়েছেন। তবে শিলাইদহে প্রকৃতি ও মানুষকে; এককথায় প্রকৃতির কোলে মানুষকে স্বসরূপে কাছের থেকে দেখলেন - তা এক নূতনরূপ। যার প্রতিফলন তাঁর অনুভূতি, উপলব্ধি, রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী। "আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে – যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত ঠেকে বাঁচাতে পারি নে। এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি – এত অসহায় অসমর্থ অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই......"।[৯]

১৯০০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তায় আধ্যাত্মিকচিন্তার উন্মেষ ঘটলেও অদ্বৈতভাবনা বা ঐক্যবোধের উন্মেষ ঘটে নি। তার চিন্তায় এই সময়ে ব্রহ্মের সঙ্গে প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে যেন স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বর্তমান ছিল। সুতরাং জীবনের এই পর্বে প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আন্তরিক ও প্রীতিপূর্ণ ছিল, কিন্তু একাত্মতার ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তায় দ্বিতীয়পর্ব (১৯০১ থেকে ১৯২১) :

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন, নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থ রচনাকাল ১৯০১ সাল থেকে কবির জীবনে আধ্যাত্মবোধের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই সময় থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে থাকেন। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন,

“মানুষের জগৎ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়া কবি প্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় পাইয়াছিলেন, প্রকৃতির জগৎ শিলাইদহে স্থানান্তরিত হইয়া তিনি মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করিলেন; এবারে তিনি এমন এক স্থানে আসিলেন যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির লীলা অপ্রকট। এবারে আরম্ভ হইল নূতন পরিচয়ের ভূমিকা। এতদিন যে বিশ্ব কল্পনা বাহিরের দিকে প্রসারিত ছিল, এবারে বাহিরের ঐশ্বর্যের অভাবে সেই বহির্মুখী কল্পনা ভিতরের দিকে নিবিষ্ট হইল। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ও ভগবৎ জিজ্ঞাসার যথার্থ সূত্রপাত এখানে”।[১০]

‘সূত্রপাত’ বলতে হয়তো কবির আধ্যাত্মিক চিন্তা এখানে গভীরতর হয় বা পরিণতি লাভ করে - তাকেই বোঝানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ও ভগবৎ জিজ্ঞাসা শৈশব থেকে দেখতে পাওয়া যায়, যা পরিবার থেকে লব্ধ। ‘নৈবেদ্যে’ সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় একটি স্পষ্ট ধর্মীয় রূপ লক্ষ্য করা যায়। আসল কথা রবীন্দ্রনাথের কবি-অনুভূতি ও ধর্মানুভূতির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। তাঁর কবিতা ও গানের পথ ধরেই ধর্মেনুভূতির আবির্ভাব ঘটেছে। “কবিধর্মই হইল রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম; সেই কবিধর্মের মূলকথা ছিল বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বজীবনের প্রতি নিবিড় প্রেম; তাঁহার ভিতরে যে অধ্যাত্মস্পৃহা গড়িয়া উঠতে লাগিল তাহাও বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের প্রতি সেই নিবিড় প্রেম লইয়াই গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ‘একে’ প্রতিষ্ঠিত হইয়া না লইতে পারিলে এই লীলাদর্শনের যোগ্যতাই জন্মে না, কারণ সেই একে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বজীবনের যে আনন্দলীলা রূপ তাহা চোখেই পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই এই একের মধ্যে প্রতিষ্ঠার অর্থ একের মধ্যে আত্মবিসর্জন নয়, একে প্রতিষ্ঠা হইল বহুর ভিতর দিয়া বিচিত্রলীলাকে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদ করিবার জন্য”।[১১] এই একের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে জগৎ, প্রকৃতি-পরিবেশ, নানা বৈচিত্র্য সত্য ও সার্থক। ‘নৈবেদ্য’ কবিতায় এই সর্বাত্মক অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় –

“তোমার ইঙ্গিতখানি দেখি নি যখন
ধূলিমুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।
যখন দেখেছি আজ, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত; শাখে শাখে ফুলে ফুলে
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁকি ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
দ্রুত সে ইঙ্গিত; শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঊর্ধ্বমুখে জাগি রহে স্থির
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত”। নৈবেদ্য, ২২নং সংখ্যক কবিতা

‘গীতাঞ্জলি’তে প্রকৃতির মধ্যে সেই ঐক্যের অনুসন্ধান করতে দেখতে পাওয়া যায় -

“আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই,
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

লুকোচুরি খেলা।”

কবির অনুসন্ধিৎসু মন এখানে খুঁজছে তাঁকে যে এই আকাশে নীল ও সাদার বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে সাদা মেঘের ভেলা ভসিয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছুই এক ব্যাপক সত্তার লীলাখেলা। কবি প্রকৃতি জগতে সেই ব্যাপক সত্তার বহুরূপিনী প্রকাশকে বারবার ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ‘প্রাচীন ভারতের একঃ” (১৯০১ সালের রচনা) প্রবন্ধে এই ঐক্যের কথা বলেছেন। বিশেষ করে উপনিষদের “বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ” এর ব্যাখ্যা করে এই অদ্বৈতভাবনাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। “এই এককে আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তিস্বরূপে দেখিতেছি। ……… এত বৃহৎ লোকসংঘ, এই অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল স্বার্থসংঘাত, তবু এ সংসার রমনীয়; তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না। ইহার দুঃখতাপও মহামঙ্গল-সংগীতের একতানে অপূর্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে, কেননা বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ”। [১২]

রবীন্দ্রনাথের এই অদ্বয়বোধের সঙ্গে উপনিষদের গভীর যোগ থাকলেও, উপনিষদের সঙ্গে তা সর্বত্র অনুরূপ নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কবি অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই অদ্বয়বোধ কবিমানসে বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে এক পরিণতি লাভ করেছে। এই সকল পরিবর্তনের মূলে রয়েছে এক ঐক্য এবং এই ঐক্যের মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য। “অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের সঙ্গে সাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যেরূপ মিল ছিল না, দ্বৈতবাদী বেদান্তের সঙ্গেও সেইরূপ মিল ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পরম সত্য এক দিকে যেমন অক্ষর, অপর দিকে তেমনই আবার অনন্ত লীলাময়। এই লীলাময়ত্বের দিক হইতে দ্বৈতবাদী বেদান্তবাদিগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহাও মোটেই হইল না; কারণ দ্বৈতবাদী বৈদান্তিগণ যেখানে লীলার কথা বলিয়াছেন সে লীলা হইল এক বিশেষ প্রকারের লীলা, অপ্রাকৃত ধামে বসিয়া নিজের স্বরূপের মধ্যে তাঁহার লীলা; প্রাকৃত জগৎ এবং প্রাকৃত জীবনের মধ্যে কোথাও কোনো লীলা নাই। ……… এই জাতীয় ভগবৎ লীলাও রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিনই আকৃষ্ট করে নাই। তিনি যে লীলার কথা বলিয়াছেন তাহার সবটাই এই পরিদৃশ্যমান জগতে – অনাদিকালে এবং অসীম দেশে বিস্তৃত অনন্ত জীবকুলের বিচিত্র জীবনলীলায়, তাহাকেই তিনি জীবন ভরিয়া দেখিতে শুনিতে জানিতে বুঝিতে আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন; সীমার মধ্যে যে অসীমের বিচিত্র লীলা তাহা আস্বাদন করাই হইল তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সাধনা”।[১৩]

এখন প্রশ্ন হল এই যে ‘ঐক্য’ এটা কি অদ্বৈতভাবনার সঙ্গে সমার্থক। অদ্বৈতভাবনার আর রবীন্দ্রনাথের ‘ঐক্য’ একার্থক নয়[vi]। “রবীন্দ্রনাথ যখন ঐক্যের কথা বলেন, তখন কোন বিমূর্ত সামান্য অথবা গুণবাচক বিশেষ্য বোঝেন না। ……

তাঁর কাছে ঐক্য বুদ্ধিগম্য নয়। বোধের বিষয়"।[১৪] এই ঐক্য বস্তুবাচক বিশেষ্যের মতো যা বৈচিত্র্যের মধ্যে উপলব্ধি হয়, কিন্তু বৈচিত্র্যের সমাহার নয়। ঐক্যবোধ বলতে বোঝানো হয় প্রকৃতি, ব্যক্তি মানুষের ও ব্রহ্মের মধ্যে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ দূর হয়ে যায়, তাদাত্মবোধ জাগ্রত হয়। অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যেই এই ঐক্যের বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তার তৃতীয় পর্যায় (১৯২১ পর থেকে ১৯৪১) :

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জগৎ জুড়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল মানবতাবাদ বা Humanism এর বিকাশ। এর সঙ্গে শিল্পবিপ্লব ক্রমশ ইউরোপ থেকে আমেরিকা, এশিয়া ও বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ছিল এবং রেনেসাঁস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিল। এর ফলস্বরূপ মানবজাতির অভূতপূর্ব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রাজ্যে কিছু অসঙ্গতি সৃষ্টি হতে দেখা গেল; যেমন স্ট্রাটোস্পিয়ারে ওজোন গহ্বর, ভূমন্ডলের তাপবৃদ্ধি, অরণ্য সংকোচন, জনবিস্ফোরণ ইত্যাদি পরিবেশের উপর এর প্রতিকূল প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন সময়মতো যদি এর প্রতিরোধ করা না যায় তবে মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। ১৯২১ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এক নূতন পর্যায়ের সূচনা দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে মানবতাবাদী চিন্তার বিকাশ এবং একই সঙ্গে প্রকৃতি-পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি। এই দুটি কাজই একসঙ্গে চলেছে। বলা যেতে পারে প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে বা প্রকৃতির কোলে মানবতাবাদী চিন্তার বিকাশ সাধন করেছেন। কারণ তিনি খুব ভালো উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃতি পরিবেশ সুস্থ থাকলেই মানুষ সুস্থ থাকবে। জীবনের এই বাঁকে এসে তাই কবি প্রকৃতি পরিবেশ, মানুষ, তথা সমগ্র সমাজজীবনের উন্নয়ন কল্পে জাগ্রত হয়ে উঠলেন। এই জাগ্রত শুধু কাব্যজগতে সীমাবদ্ধ রইলো না, নূতন নূতন কর্মপন্থার পরিকল্পনা ও কার্যে পরিণত করার জন্য জাগ্রত হয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন', 'শ্রীনিকেতন' এবং তাদের অবলম্বন করে অন্যন্য গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি পরিবেশ সহ মানুষের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করতে চেয়েছিলেন।

১৯৩৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণে বলেন – "বর্তমানে আমরা সভ্যতার যে প্রবণতা দেখি তাতে বোঝা যায় যে, সে ক্রমশই প্রকৃতির সহজ নিয়ম পেরিয়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছে। মানুষের শক্তি জয়ী হয়েছে প্রকৃতির শক্তির উপরে, তাতে লুঠের মাল যা জমে উঠল তা প্রভূত। এই জয়ের ব্যাপারে প্রথম গৌরব পেল মানুষের বুদ্ধিবীর্য, কিন্তু তার পিছন পিছন এল দুর্বাসনা। তার ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বভাবের নিয়মের মধ্যে সন্তুষ্ট রইল না, সমাজে ক্রমশই অস্বাস্থ্যের সঞ্চার করতে লাগল এবং স্বভাবের অতিরিক্ত উপায়ে চলেছে তার আরোগ্যের চেষ্টা। বাগানে দেখতে

পাওয়া যায় কোন কোন গাছ ফলফুল উৎপাদনের অভিমাত্রায় নিজের শক্তিকে নিঃশেষিত করে মারা যায় – তার অসামান্যতার অস্বাভাবিক গুরুভারেই তার সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তারপরে আসে বিনাশের পালা”।১৫

মানুষ নিজের সমৃদ্ধির জন্য প্রকৃতিকে অন্যায়ভাবে দহন করছে, অরণ্যোচ্ছেদ ও নগরায়নের ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশের বিপুল বিপর্যয় ঘটছে এর প্রতিকারে আমাদের কি করণীয় সেই বার্তা দিয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য তিনি বহু জায়গাতে ভাষণ দিয়েছেন, কলম ধরেছেন, বৃক্ষরোপন[vii] ও হলকর্ষণ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছেন। হলকর্ষণের প্রয়োজন আমাদের অন্নের জন্যে, শস্যের জন্য। আর ধরণীর প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য তার ক্ষত নিবারণের জন্য বৃক্ষরোপনের করা প্রয়োজন। তিনি বৃক্ষরোপন উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত ‘বনবাণী’ কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন কবিতায় বৃক্ষের উপকারীতার কথা বর্ণনা করেছেন।

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলেরে ধন্য করো করুণার পূন্যে
হে কমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্মর গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফুলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ।
পথিক বন্ধু, ছায়ার আসন পাতি
এসো শ্যাম সুন্দর,
এসো বা তাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর”।

১৯৩৮ সালে শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপন উৎসবের তিনি বলেছিলেন, “মানুষ অমিতচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারালো; যে তার প্রথম সুহৃদ, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। ………… প্রকৃতির সহজ দানে কুলায় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে, তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে – এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য – সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে – আবার

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া"।[১৬]

এককালের সুজলা-সুফলা ভারতবর্ষ আজ ভীষণ জলসংকটের সম্মুখীন। নদীর সঙ্গে মানুষের যোগ ভিতরকার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মাতৃভূমির মাতৃত্ব মূলত তার জলে। অথচ মৃত জলাশয়গুলি দেখে দেশে জলাভাবে চিত্র পরিষ্কার। আবার অন্যদিকে বন্যায় চারিদিকে জলে জলাকার। এই সকল সমস্যার প্রতিকারেও রবীন্দ্রনাথ ব্রতী হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে "মুক্তধারা" নাটক কথা বলা যায়, যা একটি জলধারাকে মুক্ত করার আখ্যান। মুক্তধারা নাটকে বলা হয়েছে "...... এই জল চিরস্থায়ী হোক। গ্রামবাসীকে পালন করুক, ধরনীকে অভিষিক্ত করে শস্যদান করুক"।[১৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রামের উন্নতির জন্য কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি ও মানসিক জড়তা দূরীকরণে নিজ জমিদারীতে বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে কৃষির উন্নতি করা বিশেষ দরকার। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান আমাদের দেশেও প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্যে পাঠালেন। তার এক বছর পরে আমার ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সেখানে পাঠালেন"।[১৮] এছাড়াও গ্রামের উন্নতিকল্পে এই সভা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশ সংক্রান্ত বেশকিছু প্রবন্ধ লেখেন। যেমন, পল্লীপ্রকৃতি, ভূমিলক্ষ্মী, দেশের কাজ, শ্রীনিকেতন, পল্লীসেবা, উপেক্ষিতা পল্লী, শহর ও নগর, অরণ্য দেবতা, হলকর্ষণ, তপোবন প্রমুখ। এছাড়া বৃক্ষ, বসুন্ধরা, সভ্যতার প্রতি, বৃক্ষরোপন প্রমুখ একাধিক কবিতা। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পশ্চাতেও ছিল প্রকৃতি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" এ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্যের[viii] প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, – "বিশ্বপ্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন না, কিন্তু জলে স্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাষ্টার কি তা পারে। আরবের মানুষকে কি আরবের মরুভূমিই গড়ে তোলে নি – সেই মানুষই বিচিত্র ফুলশস্যশালিনী নীলনদীতীরবর্তী ভূমিতে যদি জন্ম নিত তা হলে কি তার প্রকৃতি অন্যরকম হত না"। বিশ্বপ্রকৃতিকে বন্দনা করতে দেখা যায় 'বনবাণী'(১৯৩১) কাব্যগ্রন্থটিতে –

"সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণকরি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

সাজাইলে বসুন্ধরা”।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদীচিন্তা থেকে মানবতাবাদ সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত প্রকৃতি পরিবেশ। এমন কি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর লেখার অনুষঙ্গ হিসেবে ছিল এই প্রকৃতি। আশি বছর বয়সে (২১শে জানুয়ারী ১৯৪১) পৌঁছে বিপুলায়তন প্রকৃতি তাঁর অগোচরে থেকে গেল এই নিয়ে আক্ষেপ করেছেন -

“বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে”।। (জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ঊনবিংশ শতকে সমগ্র বিশ্বে মানবতাবাদের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতে মানবতাবাদী চিন্তা বিকশিত হলেও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল আধ্যাত্মবাদী চিন্তা। ‘পরম এক’ এর বিশ্বাস প্রকৃতি পরিবেশ ও মানবতাকে এক সূতায় বেঁধে রেখেছিল[ix]। অর্থাৎ আধ্যাত্ম বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানবতাবাদ সংক্রান্ত চিন্তা। ‘বনবাণী’র ভূমিকায় কবির আধ্যাত্মবাদী চিন্তা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় - “ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা; ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত আর গভীরতলে ‘শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্’। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। ‘এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি’ দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি”।[১৯] বনের তরুলতার ভিতর দিয়ে কবি মুক্তি লাভ করেছেন এই কথাই এখানে বলা হয়েছে। তিনি বৈরাগ্য সাধনে মুক্তির কথা বলেন নি। তিনি এই জগৎ সংসারের মধ্যে, এই প্রকৃতি পরিবেশ, এই মানুষের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ পেতে চান। কবি একের বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আবার সীমার মধ্যে, আনন্দময় লীলার জগতে ফিরে আসতে চান। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যে মধ্যে মুক্তির কথা বলেছেন, আবার প্রেমের মধ্যে দিয়ে নিখিল মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকেও মুক্তি বলেছেন। “আমার মুক্তি আলোয় আলোয়” একথা যেমন বলেছেন, তেমনই বলেছেন, “আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে”। ১৯৩৭ সালের ‘প্রান্তিক’ এর ৬ সংখ্যক কবিতায় তিনি এই মুক্তির কথা বলেছেন,

“মুক্তি এই – সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে। রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার

প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।
আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতিমাঝে, উর্ধ্বে তুলি ব্যগ্র শাখা তার
শরৎ প্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে"।

মুক্তি তো আনন্দ, আত্যন্তিক দুঃখের বিনাশই মুক্তি। মানব জীবনের লক্ষ্য মুক্তি, মানে মানবজীবনের লক্ষ্য আনন্দলাভ। রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' এ বলেছেন, "বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ; কিন্তু আমরা কেবল রূপকে দেখছি, আনন্দকে দেখছি না। সেইজন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে। আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি"।[২০]

উপসংহার :

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'The Religion of Man' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন, "The first stage of my realization was through my feeling of intimacy with Nature". শুধু প্রথম স্তর নয়, সকল স্তরের একদিকে দেখা যায় বিশ্বপ্রকৃতি আর অন্যদিকে বিশ্বমানবজীবন – এই উভয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতাতেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা সার্থক রূপ ধারণ করেছে। এই ধর্ম সংক্রান্ত আধ্যাত্মিক চিন্তা, অসীমের জগৎ থেকে পঞ্চাশোর্ধ্ব কবি বাস্তব কর্মময় জগতে সীমার('বলাকা'র সময় থেকে এই পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়, পরিণতি পায় বিশ্বভারতী সৃষ্টিতে ১৯২১ সালে) মধ্যে ফিরে এসেছিলেন। তবে তাঁর চিন্তনের কেন্দ্রে ছিল অধ্যাত্মিকতা, কারণ মুক্তি, আনন্দলাভের উদ্দেশ্যেই তিনি এই সীমার মধ্যে ফিরে এসেছিলেন। সবথেকে বড় কথা এই যাত্রাপথ, এই যাত্রাপথের তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল প্রকৃতি পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, "আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এই **ভাবেই** কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, **কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম**"?[২১] কবি যখন এই নিজেই এই প্রশ্ন তুলছেন, তখন নিশ্চিত করে বলা যায় যে তিনি প্রথমে ভাবজগতেই বিরাজ করতেন। পরবর্তীকালে ভাবজগত-ই তাঁকে বাস্তবজগতের বিভিন্ন কর্মে উদ্যোগী করে তুলেছেন। তিনি ভাবের জগৎ থেকে কেন বাস্তবজগতের দিকে ধাবিত হন তার উত্তরও তিনি নিজে দিয়েছেন। "আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়।......... আমরা, যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর

মাষ্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাষ্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত। প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।আমি এ বিষয়ে কখনও কখনও বক্তৃতাও দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবে সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন **আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার** জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম"[x]। (ঐ, পৃ ২৬) একজন কবি মাত্রই ভাবজগতে বিচরণ করে থাকে। এখানে 'ভাব' বলতে Transcendental বা অতীন্দ্রিয় বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। ভারতীয় প্রেক্ষিতে যাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা বলা যেতে পারে। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, "তাঁহার কাব্যজীবনের ভিতর দিয়াই তাঁহার একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল – পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে গূঢ়নিবিষ্ট কেবলমাত্র ভাবময় জীবন তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্তি দিতেছিল না; আপনার বেষ্টন ছাড়াইয়া একটা বড়ো ত্যাগের জীবনের জন্য তাঁহার বেদনা জাগিতেছিল। কাব্যের পথ দিয়াই তিনি **ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমাজতত্ত্বে ধর্মনীতিতে প্রবেশ করিলেন**; সর্বত্রই দেখিলেন, আপনাকে ক্রমাগত খর্ব করিয়া পূর্ণরূপে ত্যাগের আদর্শই কেবলই প্রকাশ পাইয়াছে"। (অজিতকুমার চক্রবর্তী, ব্রহ্মবিদ্যালয়) খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা যে "সমাজতত্ত্বে ধর্মনীতিতে প্রবেশ"। কাজেই এই আলোচনার সূত্র ধরে বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতি পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে ভাবের আধ্যাত্মিক জগৎ(রবীন্দ্রনাথের ধর্মনীতি বলতেই পারি) থেকে বাস্তবে(সমাজতত্ত্ব) পদার্পণকে সূচিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের শেষের দিকে শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিয়োগ জনিত বেদনা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েও প্রকৃতি পরিবেশের প্রতি বিরাগ বা বিচ্ছেদ ঘটে নি। অর্থাৎ শৈশবের 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত' থেকে জীবনের শেষ সময়ে 'জন্মদিনে', 'আরোগ্য' প্রমুখতে প্রকৃতি তাঁর সঙ্গী ছিল। এর মুল কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যা থেকে পাওয়া যায় অপরিসীম আনন্দ। আর এই আনন্দই মুক্তি। পরমাত্মা আনন্দময় ব্রহ্মের সৃষ্ট এই জগতে তিনি সকল কিছুর মধ্যে আনন্দকে খুঁজে নিয়েছেন। তিনি তো কখনই বৈরাগ্য সাধনে মুক্তির কথা বলেননি। তিনি এই জগতে প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে অসংখ্য বন্ধন মাঝেই মুক্তির আস্বাদ লাভ করতে চেয়েছেন। সুতরাং বলা যেতেই পারে যে, প্রকৃতি পরিবেশকে সহচর করে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক চিন্তনের মধ্যে দিয়ে তিনি মুক্তির আস্বাদ বা যথার্থ আনন্দ লাভ করেছিলেন। এখানেই বোধহয় তাঁর প্রকৃতি চিন্তার সার্থকতা।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

বর্তমান দিনে প্রকৃতি পরিবেশের যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি তা এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়, তবে এতটুকু বলতেই পারি যে, প্রকৃতিক সৌন্দর্যকে শুধু উপলব্ধি করে নয়, তাকে আপন করে, সমগ্রের দৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে একজন - এইভাবে দেখলে তবেই প্রকৃতি পরিবেশেরর মধ্যে সমন্বয় সাধনের দ্বারা প্রকৃতি রক্ষার কাজ খুব সহজেই সম্ভব হবে এবং এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তা সংক্রান্ত আলোচনার সার্থকতা পাওয়া যাবে।

পাদটীকা :

i "God made man in his own image and give him dominion over the earth; nature has no value apart from what it provides us, and thus we are free to exploit it without consequence" Lynn White, The Historical Roots of Our Ecological Crisis.

ii "Enviromental ethics – the study of ethics questions raised by human relations with the nonhuman environment – emerged as an important sunfield of philosophy during the 1970s. It is now a flourishing area of research". Clare Palmer, Katie Mcshane, Environmental Ethics, Article in Annual Review of Environment and Resources, October, 2014.

iii শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল প্রেরণা যে বিশ্ববোধ, সে বিশ্বের মূল উপাদান তিনটি – মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম। তিনি যখন সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা বর্ণনা করেন তখন এই তিনের লীলা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতি বিশ্বের সীমার কোটি আর ব্রহ্ম বিশ্বের অসীমের কোটি। তিনি বলিতে চান যে, স্বভাবতঃ যিনি অসীম তিনি স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যে আনন্দরূপে ধরা দিতেছেন; স্বভাবতঃ যিনি নির্গুণ তিনি স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যেই সৌন্দর্যরূপে ধরা দিতেছেন; আর স্বভাবতঃ যিনি নির্বিকার তিনি সীমার মধ্যে সৌন্দর্যরূপে ধরা দিতেছেন। কেন তাঁহার এমন খেয়াল হইল কেহ বলিতে পারে না – ইহাই তাঁহার লীলা"।(শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ, রবীন্দ্রায়ন, প্রথম খন্ড, ১৩৬৮, পৃ ২)

iv "আসলে কবিধর্মই হইল রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম; সেই কবিধর্মের মূলকথা ছিল বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বজীবনের প্রতি নিবিড় প্রেম"।(উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ ৬৮)

v "তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত – মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না"। জীবন স্মৃতি, ঘর ও বাহির, পৃ ১২

vi "এই ঐক্য অদ্বৈত নয়"। রবীন্দ্রদর্শন, পৃ ১২৮

vii" বৃক্ষরোপন উৎসব প্রথম হয় উত্তরায়ন প্রাঙ্গনে ১৯২৫ সালে কবির চৌষট্টিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে"। "রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পরিবেশ ও সুস্থায়ী উন্নয়ন, রাজকুমার সেন ও সুবর্ণা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ ১৫৬

viii অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কবি বলেছিলেন, "আধুনিক কালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে এবং যিনি শিক্ষার দান

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে"। এ সম্পর্কে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না" ।

[ix] "মানবজীবনকে এখানে যথাসম্ভব বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগে এক করিয়া লইতে হইবে, উভয়ক্ষেত্রেই বিকাশের ধারা যেন এক ছন্দে প্রবাহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার যে সমগ্র কবিপুরুষটি তাহার প্রকাশককে এই দুই দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। একদিক হল তাঁহার সকল সাহিত্যকৃতি ও সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিল্পকলা, অন্যদিক হইল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী; ইহারা এ-পিঠ আর ও-পিঠ; কিন্তু পরস্পরবিরোধী এ-পিঠ ও-পিঠ নয়, দুই পিঠকে একসঙ্গে করিয়া তবে সমগ্র রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ।

[x] অনুরূপ কথা তিনি "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" গ্রন্থেও বলেছেন। "আমি মনে করলাম শুধু মুখের কথায় ফল হবে না; কেননা এ সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে" আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৪৭

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ ২২৫

৩। Colossians, 1.16

৪। George Sessions, 1985, Salt Lake City, UT, Peregrine Smith, p 67

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবন স্মৃতি, হিমালয়যাত্রা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ ৫১

৭। বিশী, শ্রীপ্রমথনাথ, রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ, রবীন্দ্রায়ণ(প্রথম খন্ড), শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত, ১৩৬৮, বাক্ সাহিত্য, কলকাতা ৯, পৃ ১৪

৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সোনারতরী, ১৮৯৯, পৃ ৯

৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৩, ১৩৬৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ ৩৫

১০। বিশী, শ্রীপ্রমথনাথ, রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ, রবীন্দ্রায়ণ(প্রথম খন্ড), শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত, ১৩৬৮, বাক্ সাহিত্য, কলকাতা ৯, পৃ ২৮

১১। দাশগুপ্ত, শ্রীশশিভূষণ, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, পৃ ৬৮

১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, প্রাচীন ভারতের একঃ, পৃ ১৯

১৩। দাশগুপ্ত, শ্রীশশিভূষণ, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, পৃ ৭৮

১৪। গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রদর্শন, ১৩৭৫, বিশ্বভারতী, পৃ ১২৯

১৫। উপেক্ষিতা পল্লী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খন্ড, ১৪১০, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, পৃ ৩৭০

১৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অরণ্যদেবতা,পল্লীপ্রকৃতি, ১৯০৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ ৮৬

১৭। মুক্তধারা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৭ম ভাগ, ১৪১৫, পৃ ৬৯২

১৮। ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ, পল্লীর উন্নতি : পিতৃস্মৃতি, রবীন্দ্রায়ন, ২য় খন্ড, শ্রী পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত, ১৩৬৮, বাক্ সাহিত্য, কলকাতা ৯, পৃ ৪৪

১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বনবাণী, ভূমিকা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৩৮

২০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, প্রথম খন্ড, মুক্তি, বিশ্বভারতী, পৃ ২২৬

২১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, ১৩৯৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ ২৫

২২। ঐ, ২৬

২৩। চক্রবর্তী, অজিতকুমার, ব্রহ্মবিদ্যালয়, ১৯৫১, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ